মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : প্রসঙ্গ 'হলোকস্ট'

অমিত কর্মকার

আনন্দ এবং আঘাত আপাতভাবে পরস্পরবিরোধী অবস্থা; একের উপস্থিতি অন্যটির সঙ্গে কাম্য নয় কখনই। দু'শো বৎসরের বিপ্লব-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতীয় জনগণ যে স্বাধীনতা লাভ করেছিল, আনন্দের সেই পরমমুহূর্তেও বঙ্গবাসীর হৃদয়ে বিষাদের কালোমেঘ দেশভাগ এবং দাঙ্গার ক্ষত অত্যন্ত প্রকটরূপে উজ্জ্বল ছিল। আজ পর্যন্ত সে ক্ষতচিহ্নের জ্বালাময় ভ্রূকুটি লক্ষ করা যায় বাঙালির হৃদয়ে। একারণেই সমগ্র ভারতবর্ষ যেভাবে স্বাধীনতার আনন্দঘন মুহূর্তে উল্লাসে মেতে উঠেছিল, বাঙালিরা সেভাবে পারেনি। হাজার হাজার বঙ্গসন্তানের রক্তধোয়া বঙ্গভূমি অঙ্গচ্ছেদের বেদনার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিল। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের পাশাপাশি কম্যুনিস্টরাও সে সময় দেশভাগ আন্দোলন এবং দাঙ্গার ঘটনাগুলি অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে জীবনের শেষদিন অবধি কম্যুনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী ভারতীয় ফ্যাসীবিরোধী লেখক সংঘের অন্যতম সদস্য ছিলেন, ফলে তাঁর বেশ কয়েকটি ছোটগল্পে সেই নিরুপায়-অপ্রীতিকর ঘটনাগুলির বাস্তব বিশ্লেষণ পাওয়া যায়, যা আমাদের সে সময়ের ভয়াবহতা কিছুটা আঁচ করতে সাহায্য করে। দাঙ্গা এবং দেশভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু মানুষদের যে যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল, জীবনযুদ্ধের যে অনিশ্চিত মুহূর্তে তারা হঠাৎ এসে দাঁড়ায়, তাঁর সঙ্গে মিল রয়েছে জার্মানির ইহুদিদের উপর হিটলারের অত্যাচারের। হিটলারের প্ররোচনায় সেই ইহুদি গণহত্যাই হল 'হলোকস্ট'-এর ঘটনা। এই আলোচনায় দাঙ্গার ভয়াবহতা, দেশভাগের যন্ত্রণা এবং সংখ্যালঘুদের নির্মম জীবনযুদ্ধের সঙ্গে জার্মানিতে ইহুদি অত্যাচারের ঘটনার তুলনা করে, উভয় ঘটনার সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

Holocaust শব্দটির উৎপত্তি হয়েছিল গ্রীক শব্দ 'Holos'(Whole) এবং 'Kaustos'(Burned) থেকে; যার অর্থ একটি বেদিতে একজনকে পূর্ণরূপে পুড়িয়ে বলিদান করা। কিন্তু ১৯৪৫ সালে শব্দটির অর্থরূপে পরিবর্তন আসে, যখন সমগ্র ইউরোপ জুড়ে ইহুদিদের গণহত্যাকে বোঝাতে এই শব্দটির ব্যবহার করা হয়। ইউরোপিয়ান খ্রিস্টানেরা সেমিটিক জনজাতির উপর ঘৃণার দৃষ্টিভঙ্গি বহুদিন থেকেই পোষণ করতো, কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের পর সেমিটিক বিশেষত ইহুদিরা জীবনযাপনের মৌলিক অধিকারগুলি কিছুটা পেয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয় ঘটলে, হিটলারের মতো কিছু জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ববৃন্দ এই পরাজয়ের জন্য ইহুদিদের দায়ী করে। বিশুদ্ধ জার্মান রক্ত কিংবা আর্য হিসেবে কেবলমাত্র জার্মান খ্রিস্টানদের নির্বাচনের ফলে, সমগ্র জার্মানি জুড়ে ইহুদিদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায়। তবে

কেবলমাত্র ইহুদিদের ওপরই যে এই অত্যাচারের বাণ বর্ষিত হয়েছিল, তা কিন্তু নয়,-

> The position and the experience of the Holocaust victims – the Jews, but also the Roma and Sinti – in different parts of Europe often varied greatly. The Jews in Germany had been subjected to persecution since 1933. Tens of thousands of them, and the Jews who remained behind were at the mercy of the Nazi terror.[১]

এভাবেই ইহুদিদের নিকৃষ্টতর জাতি আখ্যা দিয়ে, নুরেমবার্গ আইন (১৯৩৫) প্রণয়ন করে তাদের কলঙ্কিত করে তাড়ানোর প্রচেষ্টা করা হয় জার্মানি থেকে। ইহুদিদের নির্বাচন করে তাদের সম্পত্তি, গৃহ এবং দোকানপাটের উপর হামলা করে সেসব পোড়ানো হতে থাকে (Kristallnacht)। ফলে ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৯ অবধি বহু ইহুদি পলায়ন করতে বাধ্য হয় জার্মানি থেকে; এবং যারা পালাতে সক্ষম হয়নি, তারা ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতে বাধ্য হয়।

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে জার্মানি পোল্যাণ্ড দখল করে নেয় এবং শারীরিকভাবে দুর্বল এবং প্রতিবন্ধী প্রায় ২ লক্ষ ৭৫ হাজার মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে। শুধু তাই নয় সেখানের ইহুদিদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদিত করে জার্মানরা। ১৯৪১ পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপ জুড়ে দখল কার্য করার সময় জার্মান সেনা প্রায় ৫ লক্ষ ইহুদিদের গুলি করে হত্যা করে। ইহুদিদের চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করে, তাদের নির্বাচিত (হলুদ তারার চিহ্ন দান করে) করে অত্যাচার করা হত। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে ইহুদিদের ক্যাম্পে (Auschwitz Camp) গ্যাস চেম্বার তৈরি করে হত্যার উদ্দেশে এক কীটনাশক নির্মানকারী সংস্থার থেকে বিপুল পরিমাণে কীটনাশক (Zyklon-B) আমদানি করে জার্মান সেনা। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত যার প্রয়োগে বিপুল পরিমাণ ইহুদিদের অমানবিকভাবে হত্যা করা হয়েছিল। রাজনৈতিক নেতৃত্ববৃন্দের সংকীর্ণ এবং স্বার্থান্বেষী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য একটি দেশের নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীদের অবস্থা কি হতে পারে, তাঁর প্রমাণ হলোকষ্টের ঘটনা। লক্ষ লক্ষ নিরীহ প্রাণ অকাতরে বিলীন হয়ে যায় মানবিক হিংস্রতার কাছে। মরিস হ্যাল্বওয়াচ, জ্যান অ্যাসমান এবং অ্যালিসন ল্যাণ্ডস্বার্গ এর মতো লেখকেরা পরবর্তীকালে তাদের রচনায় (Memory boom, Cultural memory, Prosthetic memory) ইহুদিদের ওপর ঘটে যাওয়া অত্যাচারের বাস্তব বর্ণনা দিয়েছেন, যার ফলে মানুষ নিজের কালিমালিপ্ত প্রতিচ্ছবি আর্শিতে দেখতে সক্ষম হয়েছে।

রাজনৈতিক ক্ষমতার লোভ এবং সংকীর্ণ স্বার্থান্বেষী মনোভাবের জন্য জার্মানিতে ইহুদিদের যে পরিণাম হয়েছিল; ভারতবর্ষের বুকেও সে ক্ষতচিহ্নের খোঁজ পাওয়া যায় কয়েকবছর পরে। যদিও সুভাষচন্দ্র বসু বহুপূর্বেই সে সম্পর্কে রাজনৈতিক নেতৃত্ববৃন্দদের সাবধান করেছিলেন,-

> তিনি ১৯৩৮-এর হরিপুরা কংগ্রেসেও বলেছিলেন বৈঠকী রাজনীতিকে বেশি গুরুত্ব দিলে ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট কিন্তু দেশকে ভাগ করে চলে যাবে। তবে নেতাজির কথা সে দিন কেউ কানেই তোলেননি।[২]

এর পরিণামে ব্রিটিশরা যখন ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য রাজী হয়, তখন দ্বিজাতিতত্ত্বের পূর্বের রোপিত বীজটি মহীরুহ আকার ধারণ করে সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। মুসলিম লিগ এবং কংগ্রেসের বিরোধে সাধারণ জনজীবনে ধীরে ধীরে ঘৃণার আবহ সঞ্চারিত হতে থাকে। কংগ্রেসের অখণ্ড ভারত স্বপ্নে কুঠারিঘাতের উদ্দেশে জিন্না

'Direct Action Day' ঘোষণা করেন ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট, যার পরিণামে কলকাতার প্রাণনাশী দাঙ্গা। শত শত মানবের শোণিতধারা সেদিন কলকাতার রাস্তাগুলি রাঙিয়ে দিয়েছিল। সেদিনের রক্তঝরা বর্ণনা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ডায়েরির পাতায় লিখে গিয়েছেন,-

> আজ হরতাল- direct action day, দাঙ্গার সংবাদ শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। দাঙ্গা হবে একরকম জানাই ছিল, তবু- কি আপশোষ! কি আপশোষ! ক্রমাগত গুজব রটছে- চারিদিকে দারুণ উত্তেজনা। কালীঘাট অঞ্চলে শিখদের সঙ্গে মুসলিমদের ভীষণ সংঘর্ষ হয়েছে শুনলাম।[৩]

'দাঙ্গা হবে একরকম জানাই ছিল' তবুও ব্রিটিশ বাহিনী এবং মুসলিম লীগ মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শাহিদ সোরাহওয়ার্দির পূর্ব-পরিকল্পনাহীনতার জন্যেই ঘটনাটি এত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। এর পরিণামে নোয়াখালির দাঙ্গা এবং সারা দেশজুড়ে রক্তক্ষয়ী প্রাণনাশের খেলা শুরু হয়েছিল। হিন্দু এবং মুসলিম উভয়েই অত্যাচারিত, প্রতারিত এবং উদ্বাস্তু জীবন উপহারস্বরূপ পেয়েছিল, এছাড়াও গুজবের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এবং একে অপরের প্রতি বিশ্বাসহীনতা ছিল উপরি পাওনা। জার্মানিতে যেমন ইহুদিদের উপর খ্রিস্টানেরা অত্যাচার করেছে, ভারতবর্ষে কিন্তু সেরকম হয়নি; এখানে দাঙ্গাবাজ এবং দাঙ্গাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল হিন্দু-মুসলিম উভয়েই। এই রক্তক্ষরণের পরিণাম স্বরূপ ব্রিটিশদের পরিকল্পিত দেশভাগ স্বীকার করে, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে।

জার্মানিতে ইহুদি নিপীড়ন যেমন ফ্যাসিবাদী নেতৃত্ববৃন্দের বহুদিনের উগ্র উস্কানিমূলক প্রচারের ফল, যার জন্য খ্রিস্টানেরা ইহুদিদের ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছিল, শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল তারা, ঠিক সেরকমই মুসলিম লীগের প্রচারিত বাণী ছিল- 'এদেশে মুসলিমদের স্বার্থরক্ষা সম্ভব নয়, তাদের যেকোনো মূল্যে আলাদা রাষ্ট্র চাই' এবং কংগ্রেসের শাসনক্ষমতা লাভের অদম্য বাসনার কারণেই ভারতের সার্বভৌম-অখণ্ডতার বহুযুগের ইতিহাস ব্রিটিশেরা মাত্র কয়েক বৎসরের চেষ্টায় ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছিল। বিষয়টির সারবত্তা বোঝা সম্ভবপর হবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৯৪৬ সালের ডায়েরির পাতায় চোখ রাখলেই; কথাকার লিখেছেন,-

> কয়েকজন মুসলমান লিগ নেতা – সারোয়ার্দ্দিকে গাল দিলেন। কয়েকজন হিন্দু – হিন্দু নেতাদের মুণ্ডপাত করলেন। তাঁরা টের পেয়েছেন যে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট নেতাদের নাচাচ্ছে - কংগ্রেস লীগ দুইয়েরই নেতাদের। নেতারা এসে হাঙ্গামা মেটাতে পারবেন সাধারণের মনে এ বিশ্বাসের একান্ত অভাব দেখলাম।[৪]

এবার প্রশ্ন আসে সেদিন কম্যুনিস্টদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল ? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের শেষদিন অবধি কম্যুনিস্ট ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলেন, ফলে তাঁর লেখনি এবং দিনলিপির পাতায় খুঁজে পাওয়া সম্ভব কম্যুনিস্টদের মতাদর্শ। কম্যুনিস্টরা সেদিন দাঙ্গারোধের উদ্দেশে Peace Committee গঠন এবং গুজব রুখতে গিয়ে হিন্দু-মুসলিম উভয়ের রোষানলের উত্তাপ সহ্য করেছিল; যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দাঙ্গারোধে কলকাতার রাস্তায় বেড়িয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, তাঁর সেদিনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলি তাঁর ডায়েরির পাতায় রয়েছে,-

> মিটমাটের চেষ্টা ব্যর্থ হবে, কাল বিকালের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছি... ধীর শান্ত আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাব না বজায় রাখতে পারলে নিশ্চয় মার খেতাম। 'শালা কম্যুনিষ্ট!' 'মুসলমানের দালাল!' রব উঠেছিল চারিদিকে।[৫]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কম্যুনিস্টদের উদারতার বর্ণনা করলেও, ইতিহাস বলে ব্রিটিশদের

মুখাপ্রেক্ষিতা এবং দেশের যাবতীয় বিষয়ে রাশিয়ার সংগঠনের দিকে চেয়ে থাকার জন্য তারা হয়ত পশ্চাতে মুসলিম লীগের উদ্দেশসাধনে সাহায্যই করেছিল।

বঙ্গমাতার কলেবরের ব্যাপ্তিতে ভীতসন্ত্রস্ত লর্ড কার্জন ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আইনের মাধ্যমে বঙ্গদেশের অখণ্ডতায় আঘাত হেনেছিলেন। সেদিন পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় বঙ্গেই শুরু হয়েছিল ব্যাপক আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথ সেদিন লিখেছিলেন,-

> বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন,
> এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।[৬]

ছয় বৎসরের নিরলস বিপ্লব এবং বহুতর চেষ্টার প্রতিক্রিয়ায় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদে বাধ্য হয়েছিলেন। রাখীবন্ধন উৎসব সেসময় পারস্পরিক সৌভ্রাতৃত্বের পরিচয়বাহী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মাত্র কয়েক দশক পরেই পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের পূর্বমুহূর্তে কেবল জাতিগত বৈষম্যের কারণে হিন্দু এবং মুসলিমেরা একে অপরের রক্তের পিপাসু হয়ে উঠেছিল। তৎকালীন দাঙ্গা এবং দেশভাগের ফলে উভয়বঙ্গের মানুষদের অসহায়তার চিত্র বাস্তবের আলেখ্য ফুটে উঠেছে আশাপূর্ণা দেবীর 'মিত্তির বাড়ি', অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকা', প্রতিভা বসুর 'সমুদ্রহৃদয়' প্রভৃতি রচনার পাশাপাশি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাসে। কেবল উপন্যাসেই নয় একাধিক ছোটগল্পেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই রক্তক্ষয়ী কলঙ্কময় ইতিহাস বর্ণনা করেছেন; এই প্রসঙ্গেই প্রশ্ন জাগে সেসবের বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা কোথায় আজ ? এ ক্ষেত্রে স্মরণীয় 'হলোকস্ট'-এর ঘটনাকেন্দ্রিক সাহিত্যের বিশ্লেষণ উত্তর-ঔপনিবেশিক কালে কতটা প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গে পাশ্চাত্যের সমালোচকের বক্তব্য,-

> There has been a conspicuous lack of interaction between the two fields, despite a host of shared concerns –after all, both Jewish and postcolonial studies grapple with the legacies of histories of violence perpetrated in the name of racist ideologies and imperialist political project.[৭]

ঠিক এরকমভাবেই, যে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় দেশবিভাগ হয়েছিল, সেই আদর্শবাদ এবং মানবমনে তার সুদূর প্রভাব আজ বিশ্লেষণ করলে উত্তর-আধুনিক কালের সাহিত্যের বিবর্তন ও বিশ্লেষণ যথার্থভাবে আমাদের নিকট পরিচিত হয়ে উঠবে।

দেশবিভাগের প্রেক্ষিতগুলি আজ বিশ্লেষণ করতে গেলে, সেই সময়টায় আবার ফিরে যেতে হয়। এক্ষেত্রে সাদাত হোসেন মান্টোর 'তোবা টেক সিং', গুলজারের 'হুজ স্টোরি', কমলেশ্বরের 'কিতনে পাকিস্তান' ইত্যাদি গল্পে পাঞ্জাব বিভাগের যেমন পরিণাম বিশ্লেষিত হয়েছে, বাংলাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, প্রতিভা বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমূখদের গল্পে তেমনিভাবেই বাঙালিহৃদয়ের ক্ষতচিহ্নটির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে কম্যুনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী ফ্যাসীবিরোধী লেখক সংঘের অন্যতম সদস্য হয়ে উঠেছিলেন, ফলে তাঁর ছোটগল্পগুলিতে কম্যুনিস্টদের দৃষ্টিতে দেশভাগ আন্দোলন বিশ্লেষিত হয়েছে। কম্যুনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণের প্রয়োজন একারণেই, যে তারা সেসময় ভারতবর্ষের তৃতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক গোষ্ঠী, তারা অত্যন্ত নিকট থেকে কংগ্রেস এবং লিগের ক্ষমতার লোভে মত্ত লড়াই দেখেছে। ১৯৪৬ সালে দেশে যখন হিন্দু-মুসলিমের সম্পর্ক অবিশ্বাসের মরচের কারণে তলানিতে পৌঁছেছে, সে সময় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'আজ কাল পরশুর গল্প'। এই গ্রন্থের

একাধিক গল্পে দেশভাগ-দাঙ্গা পূর্ববর্তী স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক ক্ষমতালোভীদের কদর্যতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতাদের জন্য যখন নিরীহ মানুষেরা দাঙ্গায় লিপ্ত হয়, তখন তা রুখে দিতে সেই নেতাদের টিঁকির নাগাল পাওয়া যায় না, এই চিত্রই অঙ্কিত 'স্বার্থপর ও ভীরুর লড়াই' গল্পে। এই গল্পে কেদার এবং কৈলাস একে-অপরের বিরুদ্ধে ভোটে লড়ছে, এবং তাদের জন্য সমর্থকেরা তাদের আহ্বান করা সভা মাঠে গিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা করেছে। কৈলাস কেদারের কাছে এসে সঙ্গে যেতে বলে দাঙ্গা থামাতে, যা শুনে কেদারের উত্তর,

> এতক্ষণে বেঁধে গেছে– এখন গিয়ে কী হবে!– মাঝখান থেকে মাথাটা ফাটবে শুধু। পুলিশ সামলে নেবে লাঠির ঘায়ে। কাজেই কৈলাসও দাঙ্গা থামাতে গেল না। [৮]

Direct Action Day-এর দাঙ্গাতেও ঠিক এমনই ঘটেছিল, যাদের জন্য হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধে, সেই রাজনৈতিক নেতৃত্ববৃন্দের দর্শন পাওয়া যায়নি।

কলকাতার দাঙ্গা এবং তাঁর প্রেক্ষিতে নোয়াখালি, বরিশালে দাঙ্গার উত্তাল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু দাঙ্গার কারণ কী ? এর উত্তর রয়েছে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'খতিয়ান' গল্পগ্রন্থের নামগল্পে- হিন্দু-মুসলিমে দাঙ্গা বাঁধানোর মূল উদ্দেশ গরীব-শ্রমিকদের দাবিদাওয়া থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে পরস্পরের চোখে পরস্পরকে শত্রু করে দেখানো। গল্পে তাই দুই বন্ধু হিন্দু ও মুসলিম শ্রমিক বলেছে,- "দেখলি তো ? আমরা শালা গরিবরাই মরলাম। না তো কি ? কে মরবে তবে ? ওনারা সব ঠিক আছেন বহাল তবিয়তে।"[৯]

দাঙ্গার মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতারা এবং কালোবাজারিরা 'বহাল তবিয়তে' থেকে সবচেয়ে বেশি ফায়দা তুলেছিল। মৃত্যু যত হয়েছিল সবই গরীব-দুঃস্থদের; যাদের ব্যবহার চিরকাল হয়েছে, যারা কোনো উপকার পায়নি। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছোটবড়ো' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের 'ছেলেমানুষি' গল্পে মানিক দেখিয়েছেন নাসিরুদ্দীন এবং তারাপদের বহুদিন ধরে বিকশিত পারস্পরিক হৃদ্যতা দাঙ্গার কলুষিত বায়ুর সংস্পর্শে এসে নষ্ট হয়েছে। তাদের সন্তান হাবিব এবং গীতা খেলাতে ব্যস্ত থাকায়, তাদের না পাওয়া গেলে একজন অপরজনকে সন্দেহ করেছে; যার সুযোগ নিয়েছিল উস্কানিদাতারা,-

> এত চেষ্টা করেও উসকানিদাতারা এ মেশাল পাড়ার শান্তিতে দাঁত ফোটাতে পারেনি, এমনই একটি সুযোগের জন্য তারা যেন ওত পেতে ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে।"[১০]

কিন্তু পিস কমেটির সভ্যদের চেষ্টায় শেষ অবধি দাঙ্গা রোখা যায়; কম্যুনিস্টরা দাঙ্গার মুহূর্তে এরকমই পিস কমেটি গঠন করে দাঙ্গা রোখার চেষ্টা করেছিল। এই গল্পগ্রন্থের 'স্থানে ও স্তানে' গল্পে নরহরি দাঙ্গায় পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে আসতে চায়নি বরং নিজের স্ত্রীকে কলকাতা শ্বশুরবাড়ি থেকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল; কিন্তু তাঁর স্ত্রী এবং শ্বশুরবাড়ির কেউ এতে রাজি হয়নি। পূর্ববঙ্গে যেমন হিন্দুরা অত্যাচারিত হচ্ছিল, তেমনিই কলকাতার বাঙালিরা মুসলিম-বিহারী-উড়িয়াদের উপর অত্যাচার করছিল,-

> মেজো শালা শ্যামল বলল, দুটো উড়িয়াকে আচ্ছা করে শিক্ষা দিয়েছি আজ জন্মে ভুলবে না। মুড়ি মুড়কির দোকানের ওই অর্জুন আর সতীশবাবুর চাকরটাকে। সুধীনবাবুর ঝি আর অর্জুনের বউটাকে ছেলেরা ধরেছিল। [১১]

অর্থাৎ দেশভাগের প্রাক্কালে জাতিতে জাতিতে বিভেদের কারণ পারস্পরিক দ্বেষের

প্রতিক্রিয়া; কলকাতায় মুসলিম-বিহারী-উড়িয়ারা অত্যাচারিত হয়ে, প্রতিশোধ স্পৃহায় নিজেদের এলাকায় বাঙালি হিন্দুদের উপর অত্যাচার করেছিল।

স্বাধীনতা লাভের পরও দেশে উদ্বাস্তুসমস্যা, শ্রমিকদের অভাব রয়েই গিয়েছিল। কম্যুনিস্টরা স্বাধীনতা দিবসে ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ ওড়াতে চাইত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ১৯৫০ সালের ডায়েরিতে এ সম্পর্কে লিখেছেন,-

> ফ্ল্যাগ কিছু কিছু উড়ছে – কিন্তু চারিদিকে ঝিমানো। প্রথম বছর এমনকি দ্বিতীয় বছরের সঙ্গে তুলনায় স্বাধীনতার মৃত্যুদিবস। কোথাও কোন উৎসাহ উদ্দীপনার চিহ্ন নেই।[১২]

স্বাধীনতার পরের বছর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মাটির মাশুল’ গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ‘আপদ’ গল্পে কণাদের স্ত্রী নলিনী তাঁর স্বামীকে কথায় কথায় ‘তোমরা স্বাধীন হয়েছ-’ বলে ভাবতে বাধ্য করে। এই প্রশ্ন কেবল নলিনীর নয়; এ প্রশ্ন সেদিন কম্যুনিস্টরা বিভাজিত দেশের সকল মানুষের কাছে করেছিল। এছাড়া দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু সমস্যার কথাও এই গল্পে বর্তমান। শুধু এ গল্পেই নয়, ‘ফেরিওয়ালা’ (১৯৫০) গল্পগ্রন্থের ‘সংঘাত’; ‘লাজুকলতা’ (১৯৫৩) গল্পগ্রন্থের ‘সুবালা’, ‘পাষণ্ড’ গল্পে এবং ‘বিচার’, ‘উপায়’, ‘কোন দিকে’ গল্পেও দেশভাগের ফলে কলকাতার বুকে সামান্য মাটি আঁকড়ে জীবন অতিবাহিত করতে আসা উদ্বাস্তু-ছিন্নমূল মানুষদের আর্ততার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

দাঙ্গা ও দেশভাগের ফলে বাঙালির শোচনীয় পরিণাম, জার্মানিতে ইহুদিদের পরিণামের মতোই করুণ। নিজের স্নেহের আবেশযুক্ত মাতৃভূমি উভয়েই ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল রাজনৈতিক চক্রান্তে। বিংশ শতক বাঙালিকে দুটি বৃহৎ আঘাত দিয়েছিল, এক বিশ্বকবির মহাপ্রয়াণ এবং অন্যটি দেশভাগ। রবীন্দ্রস্মৃতি আজও বাঙালি সুখের তরীতে বয়ে নিয়ে চলেছে; কিন্তু দেশভাগের ক্ষতচিহ্নটি বারংবার ভুলতে চেষ্টা করেও সক্ষমতা লাভ করতে পারেনি। হাজার মানুষের রক্তে রাঙানো স্বাধীনতা, ব্রিটিশদের দিয়ে যাওয়া চিরকালীন এক রোগস্বরূপ দেশভাগ; যার থেকে আজও বৃহৎ ভারতবর্ষ মুক্ত হতে পারেনি। চেষ্টা হয়ত কিছু হয়েছিল, গান্ধীজি নোয়াখালির দাঙ্গার পর সেখানে এক মাস কাটিয়েছিলেন; কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেননি। এ কারণেই নিজেও শেষ অবধি দেশভাগের পক্ষেই নিজের ভোটটুকু দিয়েছিলেন বা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কংগ্রেস কিংবা লীগের দেশভাগের প্রেক্ষিতে মতাদর্শগুলি যতটা জানা যায়, তুলনায় কম্যুনিস্টদের ভাবনা তেমন স্পষ্ট হয়না। কম্যুনিস্টরা সেদিন কী অবস্থান নিয়েছিল তা জানার জন্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি এবং সাহিত্যসম্ভারের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করে এক নবতর সংবাদ জানার চেষ্টা করা হয়েছে এ গবেষণাপত্রে।

তথ্যঋণ :

১. Have, Wichert ten, Haperen, Maria van,- ‘The Holocaust, 1933-1941-1945’, Page- 27-28, Web- https://www.niod.nl/sites/niod.nl/files/The%20Holocaust.pdf , Access on- 22/07/2020.

২. ঘোষ, মধুছন্দা মিত্র,- ‘স্বতন্ত্রতা সংগ্রাম, বিভাজন, আটষট্টি বছর’, আনন্দবাজার পত্রিকা (অনলাইন সংস্করণ), পত্রিকা তারিখ- ১৩/০৮/২০১৫,

৩. চক্রবর্তী, যুগান্তর,- ‘অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ডায়েরি ও চিঠিপত্র’, অরুণা বাগচী, অরুণা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা- ১৬।